ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ৪১, ১৪২৯-১৪৩০/২০২১-২০২৩, ৫১-৬৬
DOI: https://doi.org/10.59815/isp.vol4105

১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

মো. মহিউদ্দিন
এম.এ. (২০২০), ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract: Agriculture and Peasants are an integral part of the history of Bengal. Since ancient times the economy of Bengal was directly or indirectly dependent on agriculture. Agriculture was the mainstay of the economy during colonial rule. The Raiyats and Zamindars were intimately involved in the land system. The colonial British government carried out various experiments and reviews on agriculture to generate revenue. The colonial government made several laws especially regarding the land of Bengal. The Bengal Tenancy Act of 1885 was one of the prime Acts which was introduced by the British government. The Act of 1885 included several unprecedented rights for the peasants (such as land record forms, receipts of rent collection, termination of peasant oppression, etc.). This Act had far-reaching consequences in the Indian subcontinent during colonial rule. It was a milestone in the economic history of colonial Bengal for the interests of both the zamindars and the raiyats. Although the Bengal Tenancy Act of 1885 has been discussed sporadically, there is little extensive research work about it. This essay attempts to discuss the historical background of the Act of 1885, its provisions, its importance and impact on the society and economy of the time.

Key Words: Peasants, Zamindars, Receipts, Record of Rights.

প্রাচীনকাল হতে বাংলার অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি কৃষি। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাবে উৎপাদন পদ্ধতিতে পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার কৃষি ও কৃষকের জীবনে আসে ব্যাপক পরিবর্তন এবং পরিমার্জন; যার রেশ পরবর্তী শতকেও অনুভূত হয়। সামান্য পরিবর্তনের প্রশ্ন বাদ দিলে ব্রিটিশ শাসনের আগ পর্যন্ত শতাব্দীকাল ধরে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামই ছিল ভারতীয় আর্থিক ব্যবস্থার মৌলিক উপাদান।[১] জমিদার ও রায়তের দ্বন্দ্ব নিরসনকল্পে ব্রিটিশ সরকার প্রণীত খাজনা আইনগুলোর মধ্যে ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন ছিল অন্যতম। বাংলার কৃষি অর্থনীতিতে গতিময়তা এবং জমিদার-রায়তের পরস্পর সম্পর্ক উন্নয়নে এই আইনটি সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করেছে। এর উপর ভিত্তি করে বিশ শতকের পরবর্তী খাজনা আইনগুলো প্রণয়ন, পরিমার্জন ও সংযোজন করা হয়েছিল।

১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনটি ছিল রায়তের স্বার্থে প্রবর্তিত খাজনা আইনগুলোর মধ্যে অন্যতম পদক্ষেপ।

ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনটি ঐতিহাসিক পটভূমিতে রচিত হয়েছিল। স্যার চার্লস মেটক্যাফ বলেন, "Dynasty after dynasty tumbles down; revolution succeds revolution; Hindoo, Pathan, Mogul, Mahratta, Sikh, English are all master in turn; but the village communities remain the same."[২] অর্থাৎ একের পর এক রাজবংশ এসেছে ও পতন ঘটেছে; এক বিপ্লবের পর এসেছে আরেক বিপ্লব, হিন্দু, পাঠান, মোগল, মারাঠা, শিখ, ইংরেজ– সকলেই পর্যায়ক্রমে প্রভুত্ব করেছে, কিন্তু গ্রামীণ সমাজ একই রকম রয়ে গেছে। বাংলার কৃষি অর্থনীতি নানা ঘাত-প্রতিঘাত, বিপ্লব, প্রতিরোধ, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে রূপান্তর ঘটেছে। দীর্ঘসময় অতিক্রান্তের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ শাসনামলে ভারতীয় সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছিল। একদিকে ছিল ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক অনুসৃত রাজনৈতিক এবং আর্থিক নীতিসমূহ, অন্যদিকে ছিল বাণিজ্য, শিল্প ও আর্থিক এই তিন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ পুঁজিবাদের প্রসার।[৩] প্রাক-ব্রিটিশ শাসনামলে জমিদারদের রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা ছিল কিন্তু তারা জমির মালিক ছিল না। এ প্রসঙ্গে রাধাকমল মুখার্জী বলেন যে, ভারতবর্ষে ভূমির মালিক ছিল কৌম গোষ্ঠী বা তার একটা অংশ– গ্রাম-সম্প্রদায়, গ্রামে বসবাসকারী বংশভিত্তিক গোষ্ঠী অথবা সংঘ। ভূমি কখনোই রাজার সম্পত্তি গণ্য হতো না।[৪] ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর ভূমিব্যবস্থা ও কৃষি অর্থনীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। ১৭৬৫ থেকে ১৭৯৩ সাল পর্যন্ত বাংলার ভূমি নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ভূমিনীতি সমস্যার সমাধানের পথ উত্তরণ করার চেষ্টা করা হয়। ব্রিটিশরা ভারতীয় উপমহাদেশে যে নতুন রাজস্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন করে তা পূর্বের বহু বছর ধরে চলা গ্রাম্য সমাজের ঐতিহ্যগত বিষয়টি প্রত্যাখান করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমির উপর মালিকানা নতুন করে প্রবর্তিত হয়। ভূমির উপর গ্রামের অধিকারভিত্তিক যে প্রাচীন ভূমি ব্যবস্থা দেশে প্রচলিত ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে ব্রিটিশরা তাতে সর্বপ্রথম ভাঙ্গন ধরাল।[৫] ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সরকারের প্রধান লক্ষ্য ছিল ভূমি রাজস্বের নিশ্চয়তা বিধান।[৬]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একটি ধারা ছিল সূর্যাস্ত আইন। এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের পূর্বে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব জমা দিতে না পারায় বহু জমিদার নিজ জমিদারি হারান। সমাজকাঠামোয় সৃষ্টি হয় নতুন জমিদার শ্রেণি। নব্য প্রতিষ্ঠিত জমিদারদের মূল লক্ষ্যই ছিল বেশি পরিমাণ রাজস্ব আদায় করে লাভবান হওয়া। এসব মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকার ১৮৮৫ সালের প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়ন করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সৃষ্ট জমিদারদের সাথে প্রাক-ঔপনিবেশিক শাসনামলের জমিদারদের মৌলিক পার্থক্য ছিল। নতুন জমিদাররা পূর্বের জমিদারদের ন্যায় জমির সাথে সম্পর্কিত

ছিলেন না এবং তারা বিভিন্ন পেশার সাথে জড়িত ছিলেন। নব্য জমিদার শ্রেণি নিজেদের সুবিধার জন্য (ব্যবসায়িক ও প্রশাসনিক) কলকাতায় অথবা প্রধান প্রধান শহরে কার্যালয় স্থাপন এবং বসবাস করতেন। পূর্বের জমিদাররা ভূমির সাথে অর্থাৎ নিজ জমিদারিতে বসবাস করতেন ও জমিদারি তত্ত্বাবধায়ন করতেন। কিন্তু এখনকার জমিদাররা কোনোভাবেই জমির সাথে সম্পর্কিত ছিলেন না এবং জমিদারিতে বসবাস করতেন না। এর ফলে বাংলার কৃষি অর্থনীতিতে সৃষ্টি হলো অনুপস্থিত জমিদার শ্রেণি (Absentee Landlordism)।[৭] তপন রায় চৌধুরী অনুপস্থিত জমিদার শ্রেণিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন: (ক) রাজধানীতে বসবাসকারী, (খ) জেলা শহরের অবস্থানকারী, এবং (গ) জমিদারিতে অবস্থানকারী অথচ রায়তের উন্নতিতে বিরাগমুখী। অনুপস্থিত জমিদারদের ফলে বহু মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার শ্রেণির সৃষ্টি হয়। এই মধ্যস্বত্ব একটি স্তরেই সীমাবদ্ধ থাকেনি।[৮] পত্তনিদার আবার একই শর্তে আরো অধঃস্তন সৃষ্টি করতেন এবং এভাবে ক্রমেই দেখা গেল কৃষক ও জমিদারের মধ্যে মধ্যস্বত্বভোগী সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।[৯] ১৮৭০ এর দশকে মধ্যস্বত্বভোগী জমিদারির সংখ্যা দাড়ায় প্রায় দেড় লক্ষেরও বেশি। নিম্নের সারণিতে তা তুলে ধরা হলো:

জমির পরিমাণ	**জমিদারির সংখ্যা**
২০০০০ একরের উপরে (বড় জমিদার)	৫৩৩টি
৫০০-২০০০০ একরের মধ্যে	১৫৭৪৭টি
৫০০ একর ও তার থেকে কম	১৩৭৯২০

সূত্র: *বেঙ্গল এডমিনিস্ট্রিটিভ রিপোর্ট* ১৮৭২-৭৩

১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকারি রাজস্ব বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচ্য। ভূমি রাজস্ব থেকে ঔপনিবেশিক সরকারের আয় ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পায়। সমকালীন সরকারি রাজস্বের রিপোর্টগুলো পর্যবেক্ষণ করলে তা সহজেই অনুমেয় হয়। ভূমি রাজস্ব থেকে সরকারি আয়ের তালিকা নিম্নরূপ:

সময় (বছর)	**রাজস্ব (টাকায়)**
১৮৭৫-৭৬	৩৪৫৫৫৯২৯
১৮৭৬-৭৭	৩৬৭২৭৩৪১
১৮৭৭-৭৮	৩৬৮৫৪৯২৪
১৮৭৮-৭৯	৩৭৫২৩৫২৬
১৮৭৯-৮০	৩৭২২৪৩৪১

সূত্র: *বেঙ্গল এডমিনিস্ট্রিশন রিপোর্ট*, ১৮৭৬-৭৭, ১৮৭৭-৭৮, ১৮৭৯-৮০

উপরের পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট যে, রাজস্বের পরিমাণ প্রতিবছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। একদিকে যেমন সামন্ত প্রভুর উপর চাপ তৈরি হচ্ছে অন্যদিকে এই চাপ সমাজ কাঠামোর সর্বশেষ স্তরে কৃষক তথা রায়তের উপর পড়ছে। পাশাপাশি খাজনার বর্ধিষ্ণু হারও রায়তের উপর

নতুন চাপ সৃষ্টি করেছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার বিভিন্ন জেলায় খাজনার হার বৃদ্ধি পায়; এমনকি পূর্বের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি খাজনা নির্ধারণ করা হয়। *তত্ত্ববোধনী পত্রিকা*'র নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে বিষয়টির উল্লেখ পাওয়া যায়:

> তিনি (জমিদার) লোভাক্রান্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ ভূমি পরিমাণ পূর্ব্বক নানা কৌশলে রাজস্বের বাহুল্য করিতেছেন, কখন কোন প্রজার নিরূপিত কর পরিবর্ত্তন করিয়া যথেচ্ছা বৃদ্ধি করিতেছেন, কখন বা সাতিশয় ধন-তৃষ্ণা-পরবশ হইয়া স্বেচ্ছানুসারে এক প্রজার ভূমি গ্রহণ পূর্ব্বক অধিকতর করে, অন্যের হস্তে সমর্পণ করিতেছেন। আহা! মধ্যে মধ্যে এপ্রকারও ঘটে, যে কোন দুঃখি প্রজা ভূস্বামির নিকট এক খন্ড সকর ভূমি বা কোন অপকৃষ্ট উদ্যান গ্রহণ করিয়া যত্ন ও শ্রম সুকারে তাহার পারিপাট্য ও উন্নতি করিয়াছে, এবং আগামি বর্ষে তাহার সেই সমুদয় পরিশ্রমের যথেষ্ট ফল-লাভ সম্ভাবনায় মনে মনে পরম পুলকিত রহিয়াছে, ইতোমধ্যে অন্য এক ব্যক্তি আগমন করিয়া কহিলেক, 'আমি তোমার ভূমি অধিকার করিতে চলিলাম, ভূস্বামির নিকট সমধিক কর প্রদানে স্বীকার পাইয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছি।'[১০]

১৭৯৩ থেকে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত বাংলার বিভিন্ন জেলায় রাজস্ব বৃদ্ধির পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে বিষয়টির অধিকতর যৌক্তিকতা অনুধাবন করা যাবে।

জেলা	**খাজনার হার বৃদ্ধি**
বর্ধমান	১.৫ গুণ
মেদিনীপুর	১.৭ গুণ
হুগলী	১.৫ গুণ
২৪ পরগনা	১.৮ গুণ
নদীয়া	১.৮ গুণ
মুর্শিদাবাদ	১.৬ গুণ
দিনাজপুর	১.২ গুণ

সূত্র: *Report of the Government of Bengal on the Proposed Amendment of the Law of Landlord and Tenant in that Province,* Vol- II, 1881

খাজনা বৃদ্ধির পাশাপাশি রায়ত নতুন নতুন 'আবওয়াব' বা অতিরিক্ত কর প্রদানে বাধ্য ছিল। এই করগুলি কৃষকের ওপর 'মরার উপর খাঁড়ার ঘা' হিসেবে কাজ করেছিল। সাধারণত এ অতিরিক্ত কর আদায়ের দুটি পন্থা ছিল– (ক) লিখিত পাট্টা এবং (খ) মূল খাজনার সাথে আবওয়াব ধার্য করা। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যে সমস্ত বাড়তি কর আদায় করা হতো সেগুলো হলো ডাক খরচা, পার্বনী, তাহুরিয়া (রায়তের হিসাব পরীক্ষার ফি), খালাসি, নজর, রসদ খরচা, বিবাহ কর, জরিমানা, হাতি খরচা, ভিখা বা জমিদারের বিশেষ প্রয়োজনে দান ও তলবানি বা পিওনের ফি।[১১] এ সময় ভূমির উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে তালুকদার, হাওলাদার, চৌধুরী প্রভৃতি মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণি। পুরাতন বনেদি রাজা-ভূস্বামীরা গ্রাম্য সমাজের মঞ্চ থেকে বিদায় নেবার পর যারা নতুন জমিদারের শিরোপা পরে মঞ্চে পদার্পণ করলেন তারা হলো এই ভুঁইফোড়-অভিজাত ইজারাদার শ্রেণি।[১২] এইসব জমিদার ও রায়তের মধ্যবর্তী শ্রেণিগুলো রায়তের উপর নিজ প্রাধান্য স্থাপন

করতেন। জমিদারদের থেকে ধার্যকৃত আবওয়াব সমাজকাঠামোর সর্বশেষ বিন্দু পর্যন্ত অর্থাৎ রায়ত বা কৃষকের উপর অতিরিক্ত পরিমাণ ধার্য করা হতো। উৎপাদিত ফসল যদি প্রত্যাশ্যার চেয়ে বেশি হতো সেক্ষেত্রে জমিদার অতিরিক্ত রাজস্ব ও খাজনা ধার্য করতেন। বন্যা, খরা বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলহানি হলে জমিদার বা তাদের মধ্যস্বত্ব শ্রেণি রায়তের উপর খাজনা হ্রাস করতেন না। সমসাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলো তাদের লেখায় এ বিষয়গুলো তুলে ধরেছে। জনপ্রিয় *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকা "জমিদার রায়তের রক্ত শোষিয়া লন" শিরোনামে লিখে-

> ভূমি রাজস্ব ছিল ব্রিটিশ সরকারের অন্যতম আয়ের উৎস। আর এই ভূমি রাজস্ব বিষয়টি নির্ভরশীল ছিল কৃষির উপর। যখন ফসল উৎপাদন ভালো হয় তখন রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়; কিন্তু ফসল আশানুরূপ না হলে কৃষকের রাজস্ব, খাজনা না কমিয়ে বরং বৃদ্ধি করা হয়।[১৩]

উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে বাংলার কৃষকের উপর অত্যাচার, শোষণ-নিপীড়নের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। জমিদার, মহাজন ও তার ভৃত্যগণ কর্তৃক কৃষক অত্যাচারিত হয়। কৃষকের উপর অত্যাচারের কাহিনী তৎকালীন পত্র-পত্রিকায়, সাহিত্যে চিত্রায়িত হয়েছে। ১৮৪৬ সালে *ক্যালকাটা রিভিউ*তে 'The Zamindar and the Ryot' শিরোনামে কৃষকের করুণ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এভাবে:

> বাংলার যেকোনো স্থানেই যাই না কেনো, চোখে পড়বে সেই একই দৃশ্য। রায়তের খাদ্যের মধ্যে শুধু ভাত আর কাপড়ের মধ্যে শুধু একটি নেংটি। তার শ্রম থেকে যা কিছুই উৎপন্ন হয় তা উধাও হয়ে যায় নিমিষের মধ্যে। তার উপর উপরওয়ালাদের পাওনা দাবি অনন্ত। সব দাবিই একে একে তাকে মেটাতে হয়। এরপর সঞ্চয় আর কিছু থাকে না। ফলে তার হাতে কোনোদিন পুঁজি সৃষ্টি হয় না। বাধ্য হয়ে তাকে দ্বারস্থ হতে হয় মহাজনের কাছে। তার রক্ত শোষণ করে ফুলে-ফেঁপে উঠে মহাজন।[১৪]

রায়তের উপর সংঘটিত অমানবিক অত্যাচারের তথ্যাদি নানাসূত্রে উঠে আসে। রেভারেন্ড আলেকজান্ডার ডাফসহ আরো ২০ জন মিশনারি ১৮৭৫ সালের এপ্রিলে এক বিবৃতিতে বলেন,

> জমিদাররা চাষীদের সঙ্গে ব্যবহার করেন ঠিক প্রজাদের মতন নয়, কতকটা ক্রীতদাসের মতো। তাঁরা নিজেদের রাজা-মহারাজাদের মতো মনে করেন। প্রজাদের কাছে খাজনাদি যা তাঁদের ন্যায্য পাওনা, তার চেয়ে অনেক বেশি তাঁরা নানা কৌশলে আদায় করেন এবং বিনা পারিশ্রমিকে, নিজের নানারকমের কাজে প্রজাদের খাটিয়ে নেন। প্রজাদের উপর নানা রকম শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করা হয়। তাছাড়া অত্যাচার যে কতরকমের করেন তা বলে শেষ করা যায় না।[১৫]

বিভিন্ন উপায়ে রায়তের উপর জমিদার ও মহাজন শ্রেণি জুলুম অত্যাচার করত। এ প্রসঙ্গে *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকা 'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের দুরবস্থা' শিরোনামে লিখে,"ভূম্যধিকারির লোকে বল দ্বারা তাহাদের ধান্যগ্রহণ করে, গো সকল হরণ করেন, এবং তাহারদিগকে

গোনী-বন্ধ করিয়া জলমগ্ন করে ও প্রহার করে। ভূস্বামী ও দারোগা এবং তাহাদের কর্ম্মচারিরা প্রজাদিগের যে প্রকার শারীরিক দণ্ড করে, তাহা কলকাতাবাসি অনেক লোক সবিশেষ অবগত নহেন।"[১৬] *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা* ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৩ সালে সাধারণ প্রজা উমীর শেখের উপর যে নির্যাতন চালানো হয়েছিল সেটির কাহিনী তুলে ধরেছে এভাবে:

> কুমারখালী থানার অন্তর্গত জাহেদপুর পল্লীবাসী উমীর শেখ কুষ্টিয়ার ম্যাজিস্ট্রেটকে যে দরখাস্ত করিয়াছে, তাহার মর্ম এই—৩রা অগ্রহায়ণ তাহাকে তলপ করিয়া শিলাইদহের কাছারিতে লওয়া হয়, জমাবৃদ্ধি চাহিলে সে অস্বীকার করে। এই নিমিত্ত মারপিট করিয়া বেলা পূর্বাহ্ন চারিদণ্ড হইতে সমস্ত দিন কয়েদ রাখা হয়। পরে বেশি জমার ডৌলে দস্তখত জন্য কলম স্পর্শ করাইয়া পরে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। যে পর্যন্ত মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হইবে, সে পর্য্যন্ত আমরা এ বিষয়ে কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করি না।[১৭]

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে রায়তের উপর অত্যাচারের কাহিনী উঠে এসেছে। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে রায়তের উপর জমিদারদের অত্যাচার এবং মীর মশাররফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ' নাটকে জমিদার কর্তৃক প্রজাদের উপর শোষণ-পীড়নের কাহিনী বিধৃত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর রচনায় বাংলার কৃষকের কষ্ট-দুর্দশার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। *বঙ্গদর্শন* পত্রিকার ১২৭৯ বঙ্গাব্দের প্রথম বর্ষের পঞ্চম সংখ্যা (ভাদ্র), সপ্তম সংখ্যা (কার্তিক), নবম সংখ্যা (পৌষ), একাদশ (ফাল্গুন) সংখ্যায় 'বঙ্গদেশের কৃষক' শিরোনামে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় যেখানে কৃষকের করুণ চিত্র ফুটে ওঠেছে। জমিদার ও মহাজন কর্তৃক রায়ত অত্যাচারিত-নিষ্পেষিত হওয়ার ফলে ব্রিটিশ সরকার অনুধাবন করে রায়তের স্বার্থে খাজনা আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এর ফলশ্রুতিতে ১৮৮৫ সালের খাজনা আইন প্রণয়ন করা হয়।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সংঘটিত কৃষক বিদ্রোহগুলো ১৮৮৫ সালের খাজনা আইন প্রণয়নে ভূমিকা রাখে। রায়তের উপর অত্যাচার ও কর বৃদ্ধি ঘটলে কৃষক বা রায়তও প্রতিরোধ এবং প্রতিবাদের চেষ্টা করে। উনিশ শতকে ষাটের দশকের শেষ দিক থেকে বাংলার রায়ত জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হতে থাকে।[১৮] ১৮৫৫-৫৬ সালে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, ১৮৬৯ সালে ময়মনসিংহে এবং ১৮৭৩ সালে পাবনার সিরাজগঞ্জে অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। এ প্রসঙ্গে এম. মোফাখখারুল ইসলাম বলেন, "In the circumstances the zamindar-raiyat relation became more bitter than ever before and combined resistance by the rayats happened in several districts of eastern Bengal and the most serious of these was the Pabna Revolt of 1873."[১৯] ঢাকা, ত্রিপুরাসহ অন্যান্য অঞ্চলে কৃষক আন্দোলনের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। এ আন্দোলনগুলোতে কৃষক খাজনা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। বেশকিছু পত্রিকা ও সংগঠন যেমন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বেঙ্গলি* পত্রিকা ও *ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন* কৃষকদের দাবি-

দাওয়াগুলোকে সমর্থন, প্রচার-প্রচারণা এবং নতুন খাজনা আইন প্রণয়নের দাবি জানায়। এসব বিদ্রোহ ও দাবির পরিপ্রেক্ষিত ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন প্রণীত হয়।

এ আইন প্রণয়নের অন্যতম কারণ ছিল বিদ্যমান খাজনা আইনগুলোর নানাবিধ ত্রুটি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর বাংলার কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নে ও রায়তের স্বার্থে ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেছিল। ১৮১৯ সালের খাজনা আইন, ১৮৪১ এবং ১৮৫৯ সালের দশম খাজনা আইন ছিল উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এসব আইন, বিধি-বিধান কার্যকরি ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছিল। ১৮৫৯ সালের প্রজাস্বত্ব আইনের প্রধান ত্রুটি ছিল অস্পষ্টতা।[২০] এই আইনে দখলী রায়তের অধিকার সুনিশ্চিত করার চেষ্টা ছিল কিন্তু কীভাবে রায়ত তার অধিকার প্রমাণ করবেন বা কেমন করে সহজভাবে তা করা সম্ভব সে সম্পর্কে আইন প্রণেতাদের স্পষ্ট ধারণার অভাব ছিল।[২১] কৃষির উন্নয়নকল্পে ও রায়তের অধিকার রক্ষার স্বার্থে এসব আইন জোড়ালো ভূমিকা রাখতে পারেনি। *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা* পত্রিকা এই বিষয়ে উল্লেখ করে-

> বর্তমানে খাজনা বাড়ানোর যে নিয়ম আছে তাই রায়ত ও জমিদার দ্বন্দ্বের কারণ। একদিকে জমিদারদের অত্যাচার, অন্যদিকে বর্ধিত হারে খাজনা দিতে রায়তদের আপত্তিই এ মূল দ্বন্দ্বের কারণ। এ বিষয়ে বর্তমান আইন যথেষ্ট নয়। এ অবস্থার পরিবর্তন না হলে বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন হবে না।[২২]

১৮৮৫ সালের খাজনা আইন প্রণয়নে আরো কিছু কারণ রয়েছে। যেমন বাংলায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্ভিক্ষ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ১৮৬০ সালে সারা ভারতে, ১৮৬৬ উড়িষ্যায় এবং ১৮৭৪ সালে বাংলায় প্রকট আকারে দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হয়। ব্রিটিশ সরকার এসময় কৃষি ও রায়ত রক্ষায় পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এমনকি রাজস্ব হ্রাসের পরিবর্তে কৃষকের নিকট হতে জোর করে খাজনা আদায় করা হয়। অনেক রায়ত তার চাষাবাদের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম হারাতে বাধ্য হয়। ফলে কৃষি অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ে। ১৮৮০ সালে গঠিত 'ফেমিন কমিশন' রায়তের স্বার্থে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের সুপারিশ করে। ব্রিটিশ সরকার খাজনা আইন প্রণয়নে নতুন চিন্তা-ভাবনা শুরু করে যার ফসল ছিল ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন।

দীর্ঘ ঐতিহাসিক পটভূমির আলোকে ব্রিটিশ সরকার রায়ত-জমিদারের সম্পর্ক উন্নয়নে ১৮৭৯ সালে 'বেঙ্গল রেন্ট কমিশন' গঠন করে। সাত সদস্য বিশিষ্ট এ কমিশনের তিন জন বাঙালি ছিলেন। রেভেনিউ বোর্ডের সদস্য এইচ. এল. ডাম্পিয়রকে প্রধান করে কমিশনের অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন জে.ও. কিনিয়াল, সি.ডি. ফিল্ড, এইচ.এল. হ্যারিসন, এ. ম্যাকেঞ্জি, বাবু ব্রজেন্দ্র কুমার শীল, বাবু পিয়ারী মোহন মুখোপাধ্যায় ও মোহিনী মোহন রায়।[২৩] বেঙ্গল রেন্ট কমিশনকে তিনটি দায়িত্ব দেওয়া হয়:[২৪]

(ক) সংবিধিবদ্ধ আইনগুলো বিশেষভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করা;

(খ) বিগত বছর ধরে চলা সংশোধনীগুলোর পর্যালোচনা করা;

(গ) প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে খাজনা আইনের পরিবর্তনের সুপারিশ করা এবং নতুন খসড়া বিল প্রস্তুত করা।

কমিশন ১৮৮১-১৮৮৫ সাল পর্যন্ত আলোচনা, পর্যালোচনা এবং বিচার-বিশ্লেষণ করে নানা সুপারিশ করে। কমিশন খাজনা আইন সংশোধন এবং রায়তের অধিকার রক্ষার ওপর মতামত দেয়। সি.পি. ইলবার্টের মতে কমিশন নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের ওপর জোর দেন: (ক) তিন থেকে বারো বছর জমি রেখেছে এমন রায়তদের রাখার চেষ্টা, (খ) দখলী রায়তদের অধিকার আরো সুরক্ষিত করা, (গ) সমস্ত রায়তদের আরো কতকগুলি সুযোগ সুবিধা দেওয়া যেমন বাড়ি তৈরির অধিকার, ক্রোক থেকে অব্যাহতি, খাজনার জন্য রশিদ, জমিদার কর্তৃক জমিদারির হিসাব প্রস্তুত ইত্যাদি ও (ঘ) খাজনা হারের সারণী প্রস্তুত করা।[২৫] গঠিত সিলেক্ট কমিটি অসংখ্যবার মিলিত হয় এবং প্রায় শ'খানেক রিপোর্ট, মন্তব্য এবং স্মারকলিপি, সংযোজন-বিয়োজন, আলোচনা-পর্যালোচনাপূর্বক ১৮৮৩ সালের ২ মার্চ আইনসভায় খসড়া বিল উত্থাপন করা হয়। ১৮৮৫ সালের ১৪ মার্চ এ বিলটি আইনে পরিণত হয় এবং নভেম্বর থেকে তা কার্যকর করা হয়। প্রকাশিত আইনটিকে ১৮৮৫ সালের খাজনা আইন বা বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন-১৮৮৫ নামে অভিহিত করা হয়।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এ আইনের প্রধান লক্ষ্য ছিল জমিদারি শোষণ বন্ধ করা এবং কৃষকের উদ্বৃত্ত যেন হাতছাড়া না হয়ে পুঁজিতে পরিণত হয় সে পরিবেশ সৃষ্টি করা।[২৬] আইনের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে সি.ই. বাকল্যান্ড বলেন,

> Its 3 main objects were,- firstly, to give the settled raiyat the same security in his holding as he enjoyed under the old customary law: secondly, to ensure to the landlord a fair share of the increased value of the produce of the soil: and, thirdly, to lay down rules by which all disputed questions between landlord and tenant could be reduced to simple issues decided upon equitable priciples.[২৭]

১৮৮৫ সালের আইনের দুটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অস্থায়ী দখলী রায়তদের (settled ryot) দখলী স্বত্ব (occupancy right) দেওয়া ও অস্থায়ী ওঠবন্দি রায়তদের (non-occupancy ryot) রক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ।[২৮] এ আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যই ছিল বিদ্যমান রায়ত-জমিদারের বিরোধ, সংঘর্ষ ও পারস্পরিক উত্তেজনা প্রশমন করা।

১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের বৈশিষ্ট্য

১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের বিভিন্ন ধারায় জমিদার-প্রজার অধিকার, রাজস্ব নির্ধারণ, জমির স্বত্ব প্রদানের নিয়মাবলি প্রভৃতি সংযুক্ত করা হয়েছে। এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো[২৯]:

১. পূর্বের খাজনা আইনগুলোতে জমিদার ও প্রজার অধিকারের স্বত্বগুলোর কোনো লিখিত ডকুমেন্ট ছিল না। ১৮৮৫ সালের প্রজাস্বত্ব আইনে প্রথমবারের মতন ব্রিটিশ সরকার জমিদার ও রায়তের স্বত্ব 'Record of Rights' নামে লিপিবদ্ধ করা হয়। যেখানে

জমিদারের ভূমির ওপর কী কী অধিকার রয়েছে এবং রায়তের ভূমি ও জমিদারের প্রতি কী দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে, সেগুলো উল্লেখ করা হয়। এর মাধ্যমে ভূমিতে জমিদার ও রায়তের অধিকার নিশ্চিত হয়।

২. এই আইনের আওতায় জমিদার জমি লিজ নেওয়া, জমিদারদের কাছ থেকে রায়তের জমি গ্রহণ এবং খাজনা আদায় প্রভৃতি রশিদ (receipt) আকারে নথিভুক্ত ও রেকর্ড রাখার বিধান করা হয়।

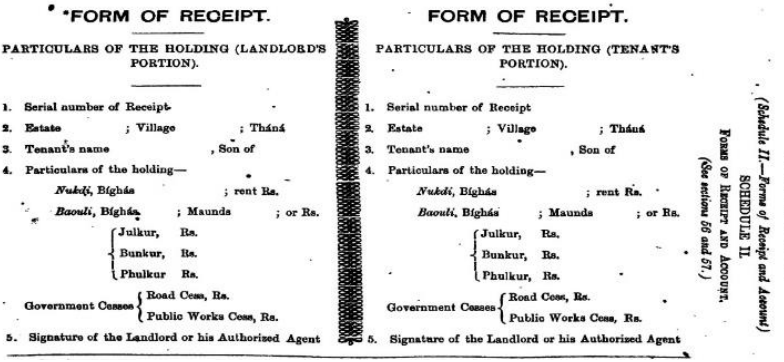

FORM OF RECEIPT.

PARTICULARS OF THE HOLDING (LANDLORD'S PORTION).

1. Serial number of Receipt
2. Estate ; Village ; Thánà
3. Tenant's name , Son of
4. Particulars of the holding—
   Nukdi, Bíghás ; rent Rs.
   Baouli, Bíghás ; Maunds ; or Rs.
   Julkur, Rs.
   Bunkur, Rs.
   Phulkur Rs.
   Government Cesses: Road Cess, Rs. / Public Works Cess, Rs.
5. Signature of the Landlord or his Authorized Agent

FORM OF RECEIPT.

PARTICULARS OF THE HOLDING (TENANT'S PORTION).

1. Serial number of Receipt
2. Estate ; Village ; Thánà
3. Tenant's name , Son of
4. Particulars of the holding—
   Nukdi, Bíghás ; rent Rs.
   Baouli, Bíghás ; Maunds ; or Rs.
   Julkur, Rs.
   Bunkur, Rs.
   Phulkur, Rs.
   Government Cesses: Road Cess, Rs. / Public Works Cess, Rs.
5. Signature of the Landlord or his Authorized Agent

BENGAL, TENANCY ACT.
(*Schedule II.—Forms of Receipt and Account*)
SCHEDULE II.
FORMS OF RECEIPT AND ACCOUNT.
(*See sections 56 and 57.*)

চিত্র: জমিদার ও রায়তের ‘Forms of Receipt and Account’[৩০]

রায়ত যখন খাজনা প্রদান করতেন তখন রায়তকে সেটির রশিদ দেওয়া হতো। এই রশিদে খাজনার পরিমাণ, খাজনা যে অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য, জমিদারের নাম, প্রজা বা রায়তের পূর্ণ ঠিকানাসহ আদায়কারীর স্বাক্ষর থাকতো।

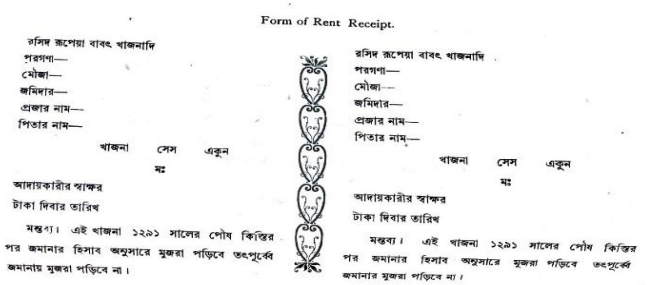

Form of Rent Receipt.

রসিদ রূপেয়া বাবৎ খাজনাদি
পরগণা—
মৌজা—
জমিদার—
প্রজার নাম—
পিতার নাম—
খাজনা সেস একুন
মঃ
আদায়কারীর স্বাক্ষর
টাকা দিবার তারিখ
মন্তব্য। এই খাজনা ১২৯১ সালের পৌষ কিস্তির পর জমানার হিসাব অনুসারে মুজরা পড়িবে তৎপূর্ব্বে জমানায় মুজরা পড়িবে না।

রসিদ রূপেয়া বাবৎ খাজনাদি
পরগণা—
মৌজা—
জমিদার—
প্রজার নাম—
পিতার নাম—
খাজনা সেস একুন
মঃ
আদায়কারীর স্বাক্ষর
টাকা দিবার তারিখ
মন্তব্য। এই খাজনা ১২৯১ সালের পৌষ কিস্তির পর জমানার হিসাব অনুসারে মুজরা পড়িবে তৎপূর্ব্বে জমানার মুজরা পড়িবে না।

চিত্র: খাজনা আদায়ের রশিদ ‘Forms of Rent Receipt’[৩১]

৩. এ আইনে ভূমির খাজনা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বলা হয় নিত্য বছর খাজনা বৃদ্ধি করা যাবে না। পনেরো বছর পর পর খাজনা বাড়ানোর নিয়ম ধার্য করা হয়। বিদ্যমান আইনের

মাধ্যমে খাজনার হার ১২.৫ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি নিষিদ্ধ করা হয়। এই ধারাটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ কেননা এখন থেকে জমিদার বা সরকার ইচ্ছানুযায়ী এখন প্রতিনিয়ত কোনো কারণ দেখিয়ে রায়তের কাছ থেকে অতিরিক্ত খাজনা আদায় করতে পারবে না। এর ফলে রায়ত সরকারের ওপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিল। এছাড়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর যেসব রায়তের খাজনার হার কখনো বৃদ্ধি পায়নি সেইসব রায়তের খাজনা অপরিবর্তিত রাখার কথা বলা হয়।

৪. এই আইনের দ্বারা ভূমিতে একটানা বারো বছর চাষাবাদকারী রায়তকে 'স্থায়ী রায়ত' বা 'Settled Raiyat' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। আইনের ২০নং ধারায় বলা হয়েছে, Every person who for a period of twelve years, whether wholly or partly before or after the commencement of this Act, has continuously held as a raiyat land situate in any village, whether under a lease or otherwise, shall be deemed to have become, on the expiration of that period, a settled raiyat of that village.

৫. এই আইনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো রায়ত শ্রেণিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলো হলো প্রথমত, স্থায়ী রায়ত বা দখলী রায়ত (Settled Raiyat); দ্বিতীয়ত, অস্থায়ী রায়ত (Non-occupancy Raiyat) আর তৃতীয়ত, কোর্ফা রায়ত বা সাধারণ প্রজা। এ আইনের বলে দখলী রায়ত ভূমি বিক্রি ও হস্তান্তরের অধিকার লাভ করে।

৬. এ আইনে এক প্রকার বিশেষ জমির সংজ্ঞায়ন করা হয় যেখানে দখলী স্বত্ব সৃষ্টি করা যেত না। যেমন- সরকার, রেলওয়ের জন্য অধিকৃত জমি, সেনাবাহিনীর জন্য অন্তর্ভুক্ত জমি, স্থানীয় সরকারের অধীনে ভূমি, জমিদারের নিজস্ব ব্যক্তিগত খামার ও জোত প্রচলিত স্বত্বের বাইরে রাখার বিধান রাখা হয়।

৭. ১৮৮৫ সালের পূর্বের খাজনা আইনগুলোতে রায়তের স্বার্থ সেভাবে রক্ষা করা হয়নি। জমিদার তার ইচ্ছানুযায়ী রায়ত বা প্রজাকে ভূমি হতে সহজেই উচ্ছেদ করতে পারতেন। কিন্তু এই আইনে বলা হয় জমি থেকে রায়তকে উচ্ছেদের পূর্বে আদালতের ডিক্রি প্রয়োজন বা অনুমোদন লাগবে। পূর্বের ন্যায় জমিদার চাইলেও প্রজাকে জমি হতে চ্যুত করতে পারবে না। আরোও বলা হয় যে রায়তও স্বেচ্ছায় চুক্তি করে নিজ ইচ্ছানুযায়ী চাষাবাদ করা বা না করার বিষয়টি অগ্রাহ্য করতে পারবে না।

৮. ১৮৮৫ সালের খাজনা আইনে রায়তের বকেয়া খাজনার জন্য জমি ক্রোক ও ফসল ক্রোক করার বিধান রাখা হয়। এক্ষেত্রে শর্ত থাকে যে যদি রায়ত জমিদারকে এক বছর পর্যন্ত খাজনা না দেয় ও সেটির জন্য জমিদার কোনোরূপ জামানত না নেন, সেক্ষেত্রে জমিদার আদালতে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালতের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে

উক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করতে পারবে। এক্ষেত্রে জমিদারকে আদালতের যাবতীয় কার্যবিধি (Procudure) অনুসরণ করতে বাধ্য-বাধকতার নির্দেশ দেয়া হয়।

৯. এই আইনের বিধান অনুযায়ী কোর্ফা রায়ত ব্যতীত অন্য রায়তদের নিয়মানুযায়ী জমির হাতবদলের সুযোগ ছিল। এক্ষেত্রে প্রতিবার হাত বদলের ক্ষেত্রে জমিদারকে অর্থ প্রদানের বিধান ছিল।

১০. এই আইনে উল্লেখ ছিল জমির আয়তন বৃদ্ধি, প্রয়োজনীয় কৃষি যন্ত্রপাতির মূল্য বৃদ্ধি, জমিদারের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও বিনিয়োগের মাধ্যমে জমির উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে জমিদার স্থায়ী রায়তের উপর খাজনা বৃদ্ধি করতে পারবেন। এক্ষেত্রে জমিদারকে আদালতে উক্ত বিষয়গুলো প্রমাণ করতে হবে। এ খাজনার হার পাশের জমির খাজনা হারের সমগুণের অতিরিক্ত হবে না।

১১. এই আইনের ধারা অনুযায়ী জমিদার ও তার অধীনস্থ কর্মকর্তা-কর্মচারিরা বাংলার কৃষকের উপর কোনোরূপ অত্যাচার করতে পারবে না।

১২. এই আইনে জমিদার যেমন ইচ্ছানুযায়ী রায়তকে ভূমি হতে উচ্ছেদ করতে পারতেন না, তেমনি রায়তও জমিদারের কাছ থেকে নেওয়া ভূমি চাষাবাদের বিষয়টি পরিত্যাগ করতে পারত না। রায়তের বাসস্থান ত্যাগ এবং জমি চাষাবাদে অনাগ্রহ জমিদারের নিকট বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশের বিধান ছিল। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশে ব্যর্থ হলে জমিদার বছর শেষে ঐ জমির স্বত্ব গ্রহণ এবং সেটির আবার নতুন করে পত্তনির ক্ষমতা লাভ করে।

ফলাফল

১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। এই আইন আইনসভায় পাশ হওয়ার পর বাংলার ভূস্বামী- জমিদাররা ব্যাপক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন। জমিদার শ্রেণি এই আইনের প্রতি তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল এবং তাদের বক্তব্যগুলো ছিল বেশিরভাগই রায়তের স্বার্থবিরোধী। পূর্ববর্তী খাজনা আইনগুলো পাশ হওয়ার পর সরকার প্রত্যেকটি আইনেই প্রতিবাদের মুখোমুখি হয়। সবচাইতে ঘোরতর ও সংঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছে ১৮৮৫ সালে, যখন বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন প্রণীত হয়।[৩২] এই আইনের বিরুদ্ধে ঢাকার নবাব আহসানউল্লাহ প্রতিবাদ জানান যে, "সরকার অকারণে প্রজার পক্ষপাতিত্ব করছেন। প্রজাকূল এমন আসকারা পেয়ে গেছে যে এরাই এখন মনে হয় জমির মালিক। এরা জমিদারের হুকুম ছাড়া জমি হস্তান্তর করেছে। এর পরে জমিদারীর আর মূল্য রইলো কোথায়?"[৩৩]

বাংলার কৃষি অর্থনীতিতে জমিদার ও রায়তদের সম্পর্ক নির্ধারণে এই আইনটি অন্যতম ভূমিকা পালন করেছিল। ব্রিটিশ শাসনের শুরু থেকে কৃষক ও জমিদারের দ্বন্দ্ব এ আইনের মাধ্যমে লাঘবের চেষ্টা করা হয়। ভূম্যধিকারী ঐ সকল আইনের বিধানের অপব্যবহার করে প্রজার খাজনা বাড়াবার ফলে এবং বর্ধিত খাজনা আদায় করার জন্য প্রজার ক্ষেতের ফসল ক্রোক করার ফলে এবং নানা ফন্দি-ফিকির করে প্রজাকে তার দখলি স্বত্ব অর্জনে বাধা দেয়ার ফলে দেশে প্রজা অসন্তোষ ও প্রজা বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল।[৩৪] প্রজা অসন্তোষ দূরীভূত করার জন্যেই ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন প্রণীত হয়েছিল।[৩৫] এর মাধ্যমে প্রথমবারের মতো রায়তের স্বার্থ অধিকাংশেই রক্ষা হয়েছিল। রায়ত নিজ জমি চাষাবাদের অধিকার লাভ করেছিল। জমিদারের ইচ্ছানুযায়ী প্রজা উচ্ছেদের ব্যবস্থা বন্ধ হয়। এই আইনের ফলে রায়ত ভূমির অধিকারের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়। রায়ত এতদিন ভূমির স্বত্ব নিয়ে যে ভয় ও আশঙ্কায় ছিল তা এ আইনের মাধ্যমে দূর করা হয়।

এ আইনের ফলে রায়তের অধিকারগুলো 'রেকর্ড অফ রাইটস' আকারে লিখিত হয় যা রায়তের অধিকারগুলো পার্লামেন্ট কর্তৃক স্বীকৃত ও গৃহীত হয়। সরকার প্রজার অধিকার সংরক্ষণে দায়বদ্ধ ছিল। আইনটির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো প্রজার অধিকার রক্ষার ফলে জমিদার ও তার অধীনস্ত কর্মকর্তারা রায়তের উপর অত্যাচার-নিপীড়ন এবং শোষণ করতে পারতেন না। এ আইন ভূমি জরিপ ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। ১৮৮৯ সাল থেকে অদ্যাবধি বাংলায় যে ভূমি জরিপ ব্যবস্থা টিকে রয়েছে যা 'ক্যাডেস্ট্রাল সার্ভে' বা 'সি.এস.' ব্যবস্থা বলে সমধিক পরিচিত সেটির প্রচলন এই আইনের পরে প্রবর্তিত হয়েছিল। এ ব্যবস্থায় জমি সহজেই পরিমাপ করা যেত। সর্বপ্রথম ১৮৮৮ সালে কক্সবাজার জেলার রামুতে এ ব্যবস্থার প্রয়োগ করা হয়। এটি সফলতার মুখ দেখলে চট্টগ্রাম শহরসহ সমগ্র বাংলায় সি.এস. পদ্ধতিতে জমি পরিমাপের উদ্যোগ নেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৮৯৪ সালের আইনে জমি পরিমাপ করে খতিয়ান তৈরির মাধ্যমে রাজস্ব নির্ধারণের নিয়মটি সংযুক্ত করা হয়। এ আইন পাশের পর ১৮৮৮ সালে কৃষির উন্নয়নে 'কৃষি পরিদপ্তর' গঠন করা হয়। এ আইন ভূমিতে প্রজাস্বত্ব প্রতিষ্ঠার ভিত্তিমূল স্থাপন করেছে।[৩৬] ১৮৮৫ সালের আইনে ভূমিতে প্রজাস্বত্ব প্রতিষ্ঠিত এবং ভূমির মালিকানায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে। তবে প্রজাস্বত্ব প্রতিষ্ঠার ফলে কৃষক শ্রেণির অভ্যন্তরীণ কাঠামোগত পরিবর্তন ছিল অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং কৃষি অর্থনীতির উপর এর প্রভাবের দিক দিয়ে সুদূরপ্রসারী।[৩৭] এই আইনের ফলাফল ছিল শহরকেন্দ্রিক ধনিক শ্রেণির জমি ক্রয়। যেসব রায়ত ঋণের জালে আবদ্ধ ছিল, তারা জমির মালিকানা বিক্রি করে ঋণমুক্ত হয়। এর ফলে সমাজকাঠামোয় অনুপার্জিত ভূস্বামী সৃষ্টি হয়। তারা জমির সাথে সম্পর্কিত না হয়েও ভূমি ক্রয়ের মাধ্যমে জমির সাথে সম্পর্কিত হয়ে পড়েছিল। উক্ত আইনটিতে এরকম নানামুখি ফলাফলের সমন্বয় সাধন ঘটেছিল।

সীমাবদ্ধতা

১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনটির উদ্দেশ্য মহৎ হলেও প্রকৃত অর্থে এ ব্যবস্থাটি জমিদার ও রায়তের মধ্যকার সুসম্পর্ক স্থাপনে কার্যকরি ভূমিকা রাখতে পারেনি। এই আইনে স্থায়ী রায়ত ও অদখলী রায়তের জন্য বিশেষ বিশেষ সুবিধা থাকলেও সাধারণ প্রজা রায়তের জন্য কোনো স্বার্থ রক্ষা করা হয়নি। পাশাপাশি বর্গাদার, অধীনস্ত রায়তের স্বার্থে উদ্যোগ নেয়া হয়নি। এছাড়া ভূমিহীন ক্ষেতমজুর ও শ্রমিকদের ব্যাপারেও তেমন কিছু উল্লেখ করা হয়নি। এই আইনের ত্রুটিসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো রায়ত যে জমি হাতবদলের সুযোগ পেয়েছিল সত্যিকার অর্থে তারা স্বাধীনভাবে জমি হস্তান্তর করতে পারত না। এই আইনের 'আবওয়াব' বা 'অতিরিক্ত কর' নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলেও জমিদাররা তা আদায়ে বদ্ধ পরিকর ছিল। বাংলার রায়তের উপর জমিদাররা যারা নিজ জমিদারিতে অনুপস্থিত ছিল তারা এই কর আদায়ের জন্য কর্মকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। এই অতিরিক্ত কর আদায় নিয়ে ব্রিটিশ সরকার তেমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

এই আইনের আরেকটি সীমাবদ্ধতা হলো বাংলার কৃষি অর্থনীতিতে একটি ধনিক কৃষক শ্রেণির উত্থান। মূলত যেসব কৃষক ঋণগ্রস্ত, অসহায় ছিল তারা ঋণ পরিশোধের জন্য জমির স্বত্ব এ ধনিক শ্রেণির নিকট বিক্রি করে দিতেন। তারা আবার নিজেদের অধীনে থাকা বিশাল আয়তনের জমি 'কোর্ফা' বা সাধারণ প্রজার নিকট স্বত্ব দিয়ে চাষাবাদ করাতেন। ফলে রায়ত শ্রেণির মধ্যে আরেকটি শ্রেণির সৃষ্টি হয় আর সেটির নাম হলো 'অধীনস্ত রায়ত' বা 'Under Tenants'। যাদের কোনো ভূমি ছিল না সেসব রায়ত এ জমি চাষাবাদ করে জীবন নির্বাহ করত। এই আইনের সীমাবদ্ধতায় দেখা যায় জমিদার শ্রেণি রায়তের বিরুদ্ধে কোনো মামলা, অভিযোগ দায়ের বা রায়ত জমিদারের বিরুদ্ধে মামলার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময় জমিদার প্রভাব খাটিয়ে নিজের আনুকূল্যে মামলার ফলাফল নিয়ে আসতেন। কেননা ইউরোপীয় কর্মকর্তাদের সাথে তাদের সুসম্পর্ক ছিল এবং সহজেই তাদের প্রভাবিত করে মামলার রায় পরিবর্তন করতেন। ফলে আদালতে কৃষকের ন্যায্য অধিকার পাওয়াটা ছিল দুষ্কর ও অকল্পনীয়। এই আইনে কৃষকের উপর অত্যাচার না করার বিষয়টি শুধু কাগজে কলমে রয়ে যায়। কৃষকদের উপর তখনও অনেক অত্যাচার-নির্যাতন করার অসংখ্যা প্রমাণ পাওয়া যায়। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন যে রায়তের স্বার্থ রক্ষা করতে পারেনি তা তৎকালীন একজন কৃষকের করুণ কাহিনীর চিত্র *বাকরগঞ্জ কালেক্টর'স রেকর্ড রুম*-এর নথি থেকে প্রতীয়মান:

> কৃষকের নাম ছমিরদ্দী, বাড়ী বরগুনায়, আদি বাড়ী বিক্রমপুর। ১৮৭০ সনের দুর্ভিক্ষে তার পিতা তাকে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়। ১৮৭৮ সনের প্রকাণ্ড মহামারীতে তার মনিব ও মনিবের সব পরিবার সদস্য মারা যায়। মনিবের সম্পত্তি সে প্রাপ্ত হয়। ১৮৮৬ সনের জলোচ্ছ্বাসে তার ছেলে-মেয়ে গরু-বাছুর ভেসে যায়। পরিবারের কোন প্রিয়জনকে ফিরে পাবার মানসে সে অর্ধেক ভূ-সম্পত্তি এক পীরকে দান করে। পীর

> সে জমি আরেকজনের কাছে বিক্রি করে দেয়। ছমিরদ্দী তার দানের কোন ফল না পেয়ে জমি দাবী করে। শুরু হয় মামলা। মোকদ্দমার খরচ জোগাতে সে বাকি জমি বন্ধক দেয় প্রতিবেশী কালুর কাছে। ১৮৯২ সনের প্রচণ্ড বসন্ত মহামারীতে ছমিরদ্দীর বসন্ত হয় ও সে অন্ধ হয়ে যায় এবং ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করে।[৩৮]

এই আইন পাশ হওয়ার পরেও বাংলার রায়তের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটেনি, অধিকন্তু কিছু সুবিধাভোগী শ্রেণির অধিকার সংরক্ষণে ব্রিটিশ সরকার অধিক মনোযোগী ছিল।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলার কৃষি অর্থনীতিতে রায়ত ও জমিদারের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণে ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। ব্রিটিশ সরকার নিজেদের শাসনকে দীর্ঘায়িত এবং কৃষক আন্দোলনকে প্রশমনের জন্য এই আইনের অবতারণা করেছিল। অথচ এই আইন পাশ হওয়ার পরে বাংলার জমিদার ও রায়তের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় এবং বাংলার জমিদাররা তীব্র প্রতিক্রিয়া ও উষ্মা প্রকাশ করে। সত্যিকার অর্থে এই আইনে রায়তের কিছু স্বার্থ রক্ষা করা হলেও বাংলার দুই প্রধান শ্রেণিকে (জমিদার ও রায়ত) পরস্পরের মুখোমুখি অবস্থানে দণ্ডায়মান করেছিল। তবে এই আইনে রায়তের অধিকারের সুরক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনটি বাংলার কৃষি সমাজে কাঠামোগত পরিবর্তন আনয়ন করেছিল। ফলে ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোয়ও পরিবর্তন সাধিত হয়। কৃষক বিদ্রোহের মাত্রাগুলোও তুলনামূলকভাবে হ্রাস পেয়েছিল। এই আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার আবহমান বাংলার নিগৃহীত, নিষ্পেষিত রায়তের স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে নতুনভাবে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছিল যা পরবর্তীতে উপমহাদেশের ব্রিটিশ শাসন নীতিতে পরিলক্ষিত হয়।

টীকা ও তথ্যসূত্র

১. এ. আর. দেশাই, *ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি* (কলকাতা: কে পি বাগচী এন্ড কোম্পানি, ১৯৮৭), ৭

২. G.S. Ghurye, *Caste And Race in India* (Bombay: Popular Prakashan, 2008), 24

৩. *প্রাগুক্ত*, ২৭

৪. এ. আর. দেশাই, *প্রাগুক্ত*, ৩৩

৫. G.S. Ghurye, *প্রাগুক্ত*, ৩৪

৬. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস (উনবিংশ শতাব্দী)* (কলকাতা: কে পি বাগচী এন্ড কোম্পানি, ১৯৮৭), ১

৭. *প্রাগুক্ত*, ৪

৮. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ ১৮৫৭-১৯০৫* (ঢাকা: অনন্যা প্রকাশ, ২০১৯), ৯৩

৯. *প্রাগুক্ত*, ৯৩

১০. *তত্ত্ববোধনী* পত্রিকা, ৮৪ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৭৭২ শক

১১. এম. ওয়াজেদ আলী, *বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭)* (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০০), ১০০

১২. বিনয় ঘোষ, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র*, ৪র্থ খণ্ড (কলকাতা: প্রকাশ ভবন, ২০১৬), ৪৫

১৩. *ঢাকা প্রকাশ*, ১১ আশ্বিন, ১২৬৮

১৪. সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস: ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো* (ঢাকা: চয়নিকা, ২০০৮), ২৯১

১৫. বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা ১৮০০-১৯০০* (ঢাকা: বুক ক্লাব, ২০১৫), ২৪

১৬. *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকা, ৮৪ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৭৭২ শক

১৭. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদপত্র (১৮৪৭-১৯০৫)*, ২য় খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৭), ২৪

১৮. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, ২৮

১৯. M. Mufakharul Islam, *An Economic History of Bengal 1757-1947*, (Dhaka: Adorn Publication, 2021), 165

২০. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, ১৯

২১. *প্রাগুক্ত*, ১৯

২২. *গ্রামবার্তা প্রকাশিকা*, ১৩ জুলাই ১৮৭৬

২৩. কাবেদুল ইসলাম, *বাংলাদেশের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা*, ২য় খণ্ড (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০২), ৩০৭

২৪. Kedar Nath Roy, *The Law of Rent And Revenue of Bengal: Being The Bengal Tenancy Act, Putni Laws And Others Revenue Acts with Notes, Annotations, Judicial Rulings And Rules of The Local Government, High Court, And The Board of Renue* (Calcutta: The Baptist Mission Press, 1888), 1

২৫. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, ৩৩

২৬. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৮-১৯৭১*, ২য় খণ্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১৭), ২৩৯

২৭. Buckland, Charles Edward, *Bengal Under the Lieutenant-governors: Being a Narrative of the Principal Events and Public Measures During Their Periods of Office, from 1854-1898,* Vol.2 (New Delhi: Deep Publications, 1976), 813

২৮. Rameshchandra Dutt, *The Economic History of India*, V-2, (New Delhi: Publications Division, 2006), 319

২৯. Kedar Nath Roy, *প্রাগুক্ত*, 46-47। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য Dwarkanath Chuckerbutty, *The Bengal Tennancy Act: Act VII. of 1885* (Culcutta: Culcutta Advertiser Press, 1885), 3-5

৩০. Dwarkanath Chuckerbutty, *The Bengal Tennancy Act: Act VII. of 1885* (Culcutta: Culcutta Advertiser Press, 1885), 113

৩১. Kedar Nath Roy, *প্রাগুক্ত*, ৫৫৩

৩২. সিরাজুল ইসলাম, *বাংলাদেশের ভূমিব্যবস্থা ও সামাজিক সমস্যা* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৭৮), ১৪

৩৩. *Nowab Ahsanullah's Report on the working of the Bengal Land Tenancy Act of 1885, Government of Bengal's Land Revenue Proceedings*, September 1892, Nos. 16-21

৩৪. কাজী এবাদুল হক, *ভূমি আইন ও ভূমি ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৬), ১২৩

৩৫. *প্রাগুক্ত*, ১২৩

৩৬. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, ২৪০

৩৭. *প্রাগুক্ত*, ২৪০

৩৮. সিরাজুল ইসিলাম, *প্রাগুক্ত*, ২৬-২৭